মাহমুদুল হকের *প্রতিদিন একটি রুমাল* : জীবনোপলব্ধির স্বরূপ

মাখন চন্দ্র রায়*

[সারসংক্ষেপ : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাশিল্পী। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জনপদের প্রাণস্পন্দনকে উপজীব্য করে সাহিত্যে আধুনিকতা রূপায়ণে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও তাঁর গল্পকার সত্তা অনুপেক্ষণীয়। যুগ-যুগান্তর বাহিত বাঙালির প্রাণময়তাকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে ছোটগল্পের অবয়বে রূপদান করেছেন তিনি। দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ লেখক মাটিমাখা সাধারণ মানুষকেই আবাহন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। কোনো কোনো গল্পে নগর জীবনের প্রতিভাস নির্মাণেও তাঁর শিল্প-কুশলতার পরিচয় স্পষ্ট। তাঁর লেখার প্রাখর্য, ভাষার সুসমঞ্জস ব্যবহার এবং বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমাজ ও জীবনের বাস্তবিক উপস্থাপনা তাঁকে স্বকীয়তায় ভাস্বর করে তুলেছে। মাহমুদুল হকের *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪) গল্পগ্রন্থে বিধৃত জীবনানুভবের স্বরূপ অনুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।]

বাংলাদেশের সাহিত্যে ষাটের দশক অধিক সংখ্যক প্রতিভাদীপ্ত লেখকের আগমনে হয়ে উঠেছিল বহুমাত্রিক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রভূমি। মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) এই সময়ের লেখকদের মধ্যে অন্যতম ব্যতিক্রম শিল্প-ব্যক্তিত্ব। এক দশকের অপরিসর সাহিত্য জীবনে আটটি উপন্যাস, একটি গল্পগ্রন্থ, একটি কিশোর উপন্যাসসহ বেশ কিছু অগ্রন্থিত গল্পের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মাহমুদুল হকের শিল্পভুবন। শিল্পমানে ঋদ্ধ স্বল্পসংখ্যক সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসল গড়ে নিয়েছেন তিনি। দোষে-গুণে ভরা রক্ত-মাংসের মানুষকে সাহিত্যের কেন্দ্রে রেখে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি সবকিছুকেই অবলীলায় স্পর্শ করে গেছেন লেখক। চেনা-অচেনা কিছু চরিত্রের বহির্বাস্তব ও অন্তর্বাস্তবকে রূপায়ণের মধ্য দিয়ে জীবনকে তিনি দেখেছেন অপার সম্ভাবনার আধার হিসেবে। স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি সাহিত্যে প্রচল সমাজকে অঙ্গীভূত করেছেন। শৈশবে হারানো জন্মভূমির স্মৃতি, স্বদেশের পরিজনের সঙ্গে অতিবাহিত সময়ের সুখ-দুঃখ তাঁর সাহিত্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে বারংবার। দেশ-বিভাগের পূর্ববর্তী ও অব্যবহিত সময়ে দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিত্রও উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যে। বর্তমানের মাঝে তিনি পেছনে ফেলে আসা প্রকৃতি-পরিবেশ ও স্বজনদের খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রেক্ষণবিন্দুর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের সঠিক চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪) গল্পকার মাহমুদুল হকের সাফল্যের চূড়াস্পর্শী গল্পগ্রন্থ। যাপিত জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও চিরচেনা কিছু চরিত্রের মেলবন্ধনে ঋদ্ধ মোট এগারোটি ছোটগল্প এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অসাধারণ বয়নকৌশল ও ভাষার হৃদয়গ্রাহী বুননে তাঁর গল্প পাঠককে এক মুগ্ধতার জগতে নিয়ে যায়। *প্রতিদিন একটি রুমাল* গ্রন্থের প্রতিটি গল্পই ভিন্ন সুর ও স্বরের সমন্বয়ে ঋদ্ধ। টুকরো টুকরো স্মৃতি, ঘটনাংশ আর প্রাণময়তায় সমৃদ্ধ গল্পগুলো অত্যন্ত সজীব ও সঞ্জীবনী ক্ষমতাপুষ্ট।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের নানা বাস্তবতার গল্প রচনা করেছেন মাহমুদুল হক। অসামান্য ভাষামাধুর্য, চরিত্রচিত্রণ আর নির্মাণ-কুশলতায় মানবপ্রবৃত্তির সঙ্গে গভীর নৈকট্য অর্জনের সামর্থ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম কুশলী কণ্ঠস্বর। ঔপন্যাসিক হিসেবে সমধিক পরিচিত মাহমুদুল হক গল্প লিখেছেন কিন্তু প্রকাশের ব্যাপারে মনোযোগী হননি। প্রায় না-লেখার সময়ে এসে প্রকাশ করেছেন *প্রতিদিন একটি রুমাল* (১৯৯৪) আর *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৯)—যার কলেবর ধারণ করেছে পূর্বোক্ত গ্রন্থের এগারোটির সঙ্গে নতুন তিনটি মিলিয়ে মোট চৌদ্দটি গল্প। পরবর্তীকালে প্রকাশিত *মাহমুদুল হকের অগ্রন্থিত গল্প* (২০১০) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বিয়াল্লিশটি গল্প। অর্থাৎ তাঁর গ্রন্থিতের চেয়ে অগ্রন্থিত গল্প তিনগুণ বেশি। "মাহমুদুল হকের ঔপন্যাসিক স্বভাব যতটা বিকশিত ও নিজের কাছে স্বচ্ছ ছিল, ততটা ছিল না গল্পকার হিসেবে" (সিরাজ, ২০১৪ : ৭৯)। তাঁর আত্মস্বীকৃত দুর্বলতাজনিত অনীহা অর্থাৎ সৃষ্টিশীল অতৃপ্তির ফলেই হয়তো গল্পগুলো তিনি গ্রন্থনায় অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সাবলীল বর্ণনা, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, ধীর-স্থির মানবিক জিজ্ঞাসায় ঋদ্ধ তাঁর *প্রতিদিন একটি রুমাল* গ্রন্থের গল্পগুলো। অত্যন্ত সুকৌশলে তিনি মানুষ ও সমাজ, প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্ব, সত্তা ও প্রবৃত্তি নিয়ে আপাত নিস্পৃহ অথচ তীক্ষ্নভেদী ভঙ্গিতে সাহিত্যে খেলা করেছেন।

মাহমুদুল হকের আধুনিক শিল্পচৈতন্যের স্পর্শে তাঁর ছোটগল্পের রূপনির্মাণ ও পরিবেশনায় আধুনিকতার স্পন্দন স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। গ্রামীণ সাধারণ জীবনের প্রতি সহজাতভাবে আকৃষ্ট গল্পকারের সাহিত্যে সাধারণ মানুষেরাই আঞ্চলিকতার স্পর্শমণ্ডিত হয়ে অকৃত্রিমভাবে উপস্থাপিত হবার অবকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে আত্মস্থ করে বিষয়ানুযায়ী নির্মিত চরিত্রের কণ্ঠে তিনি সেই ভাষার উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন। আটপৌরে ভাষার কুশলী ব্যবহার তাঁর ছোটগল্পের স্ফূর্তি ও শিল্পমাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেছে। উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে বয়নে ও চিন্তনে জীবনের অদেখা ভুবনের পরিচায়ক মাহমুদুল হক ছোটগল্পের জগতেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর *প্রতিদিন একটি রুমাল* গল্পগ্রন্থে পরাভূত জীবন, বিপন্ন সময় ও বিচূর্ণ স্বপ্নের আটপৌরে জীবনের টানাপোড়েনের চিত্র পাওয়া যায়। যাপিত জীবনের নানা সংগ্রাম-সংঘর্ষ এমনকি মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা নিরুদ্ধ যন্ত্রণা ও স্বপ্নভঙ্গের হতাশা এই গল্পগ্রন্থে ভিন্ন আঙ্গিকে চিত্রিত হয়েছে। মাহমুদুল হকের গল্পসমূহে স্বপ্নচারী প্রতিক্রিয়াপ্রবণ মানুষেরা নস্টালজিক জগতের বাসিন্দা। সংকটময় সময়ের চাপে প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তারা গল্পের কেন্দ্রে এসে হাজির হয়। দেশ-বিভাগের ফলে শেকড়বিচ্যুত এই অনিকেতন মানুষেরা অন্তরে এক পরাভবকামী বেদনা বহন করে চলে। মাহমুদুল হকের গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই তাই নিভৃতচারী, অল্প আঘাতেই কাতর হয়ে তারা বর্তমান থেকে অতীতে পলায়ন করতে চায়। শেকড়-সন্ধানী এই চরিত্রগুলো ভয়ানকভাবে বেদনামগ্ন। এছাড়াও মধ্যবিত্তের বিধ্বস্ত জীবনের চালচিত্র এ গ্রন্থে নানাভাবে উঠে এসেছে। অস্থির সময়ে স্বার্থপরের মতো অপমানিত মানুষের নিরুপায় আপসকামিতায় নিমগ্ন সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত মানসও বিম্বিত হয়েছে তাঁর গল্পভাষ্যে। টিকে থাকার অনিবার্য প্রয়োজনে সামাজিক বিশ্বাস, আবহমান নীতিবোধ, মানবীয় মূল্যচেতনাকে বিসর্জন দিয়েছে মানুষ। মাহমুদুল হকের গল্পে দুর্বহ সময়ে মানবীয় নৈরাজ্যের এইসব দুঃসহ অভিজ্ঞতা বাণীরূপ লাভ করেছে।

মাহমুদুল হক তাঁর 'হৈরব ও ভৈরব' গল্পে ইছামতী পাড়ের এক বাদ্যকার পরিবারের সুখ-দুঃখের কাহিনিকে গল্পরূপ দিয়েছেন। হৈরব ও তার পুত্র ভৈরবের ব্যক্তিজীবন সূত্রে অনাবৃত হয়েছে তাদের যাপিত জীবনের গ্লানিকর অভিজ্ঞতার চিত্র। পিতা-পুত্রের কাহিনির মধ্যে অনিবার্যভাবেই লেগেছে সময় সমাজ রাজনীতির তীব্র অভিঘাত। দেশ-বিভাগ, সামন্ত অর্থনীতির ভাঙন ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সাম্প্রদায়িক অনাচারে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে তাদের গৌরবময় ঐতিহ্যপূর্ণ জীবনযাত্রা। প্রতিদিন হাজারো তুচ্ছ অপমান ও কদর্য টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভৈরবের লাঞ্ছিত জীবন কেটে যায়। "মন অন্নময়, অন্ন নাই তো মনই নাই"—এই অন্নের ভাবনা দুই বাপ-বেটা, হৈরবের স্ত্রী যোগমায়া, যোগমায়ার ভাষায় হৈরবের 'ভাতার খাকি বোন' দয়ার

মধ্যেও সংক্রমিত। গনিমিয়ার ঋণের জালে বন্দি হৈরব সংসার জীবনেও কোণঠাসা। ননদ-ভ্রাতৃবধূর তুমুল ঝগড়া হৈরবের মনের দুর্ভাবনাকে তীব্র করে তোলে। বাস্তবতার জটিল আবর্ত হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় হৈরব হয়ে ওঠে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত এক বিষণ্ন মানুষ। কলহে ক্লান্ত যোগমায়া যখন পা লম্বা করে কাঁদতে বসে হৈরব তখন ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে অতীতের স্মৃতি হাতড়ায় :

> ভৈরব নিজের কাছে কাঁদবে বলে পা বিছিয়ে বসে। কত কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সিরাজদিখাঁর সেই পাতক্ষীরের কথা, জীবে স্বাদ লেগে আছে এখনও। মনে পড়ে রামপালের কলামুলোর কথা, গাদিঘাটের কুমড়ো, আড়িয়াল বিলের কই মাছ, কত কিছু। আতরপাড়ার সেই দই, আহারে, সব গেল কোথায়। গোটা গ্রাম জুড়ে ছিল কদমের বন, বর্ষার নদী ধীর মন্থর গতিতে কেঁপে উঠে শেষে কদমের বনে গিয়ে ইচ্ছে করে পথ হারিয়ে 'এআমারকিহলগো' ভান ধরে ছেলেমানুষিতে মেতে উঠত। এখন গ্রাম কী গ্রাম উজাড়, দেশলায়ের কারখানা গিলে ফেলেছে সবকিছু। (মাহমুদুল, ২০২১ : ৩৫)

অতীতে হৈরব মেলায়-উৎসবে-পার্বণে ঢাক বাজিয়ে আনন্দ পেয়েছে ও উপার্জন করেছে। সময়ের অনিবার্যতায় একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে যাওয়ায় এখন আর ঢাকের সেই পসার নেই। মুসলিম রমজানের সঙ্গে তার কন্যা ভানু ঘর বাঁধায় পরিবারের সবাই ভুলে গিয়েছে তাকে। বাদ্যকার হৈরবের কোমল হৃদয়ে তার কন্যাস্মৃতি তোলপাড় করে। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে গ্রামজীবনে ভাঙন আসে। সংস্কৃতির আবহমান রূপটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। হৈরবের স্মৃতিলোকে চকিতে দেখা দেয় অতীতের সামষ্টিক প্রাণপ্রবাহ আর নাড়িছেড়া মেয়ে ভানুর কল্পকথা। বড় ছেলে ভরত ভারতে গিয়ে প্লাস্টিক ফুলের মালিগিরি করে দিন চালালেও ঢাকী বাপকে সে অস্বীকার করতে চায়। পূজার সময় কলকাতার ঢাক বাজাতে গেলে একদিন ছেলে ভরত তাকে নির্দয়ভাবে তিরস্কার করে। পুত্রের এই লাঞ্ছনায় তীব্র উদ্বাস্তুবোধ নিয়ে হৈরব মনের অজান্তেই আস্তিক্য চেতনায় পৌঁছে যায়। বৈরি সময় ও মানুষের রূঢ় চাপে তার মধ্যে তৈরি হয় গভীর নিরস্তিত্বের বোধ। নব্য পুঁজি গ্রামের সংহতি নষ্ট করেছে, নদী তছনছ করেছে বসতভিটা। নিয়ত ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে নিরুপায় নিরাশ্রয় হৈরব বিকল্প আশ্রয়ের সন্ধানে স্মৃতিলোকে নিমগ্ন হয়।

গল্পকার মাহমুদুল হক আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার আলোকে গল্পের নায়ক ভৈরবের সামনে উপস্থিত করেন স্মৃতিআশ্রয়ী এক বিকল্প জীবনপট। হৈরবের জীবনের লড়াই প্রান্ত থেকে এক সময় কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়। ব্যক্তি হৈরব সংঘবদ্ধ হবার ব্রত জানে না বলে গনিমিয়ার লালসা হতে বোন দয়া ও পৈতৃক ভিটা রক্ষার জন্য অনুনয় করে। নিয়তিকে হৈরব যেমন অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি পারেনি তার পুত্র ভৈরবও। কলুবাড়ির পুকুরপাড়ে জ্যোৎস্নালোকিত জঙ্গলে গানিমিয়াকে ঢাকের বাজনা শোনাতে গিয়ে প্রতিশোধকামী হয়ে ওঠে ভৈরব। গনিমিয়ার চামড়ায় দশখুশি বাজাতে চায় সে। কিন্তু বাজনা শেষে ভৈবর লক্ষ করে :

> গনিমিয়ার পিঠ নয়, পরিশ্রান্ত ভৈরব এক সময় অবাক বিস্ময়ে দেখে এতক্ষণে তার নিজের ঢাকের গায়েই সর্বশক্তি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনেছে; চামড়ার দেয়াল আর ছানি ফেঁসে গেছে, চুরচুর হয়ে ছিটকে পড়েছে টনটনে আমকাঠি, বেঘোরে নিজের ঢাকটাকেই চুরমার করেছে এতক্ষণ। (মাহমুদুল, ২০২১ : ৪১)

এই নিস্ফল প্রতিশোধস্পৃহার মধ্যেই নিম্নবর্গীয় মানুষের স্বাভাবিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। মনের ক্ষোভকে চাইলেই বাস্তবে রূপ দেয়া যায় না—বিধায় 'হৈবব ও ভৈরব' গল্পটি কয়কীর্তন গ্রামের সামূহিক বাস্তবতার বয়ান হয়ে ওঠে। মাহমুদুল হক আঞ্চলিক ভাষার আবহে রূপময় করে তুলেছেন আর্থ-সামাজিক অনুশাসন ও দীর্ঘ বঞ্চনার বিপরীতে লাঞ্ছনা ও শোষণের বিরুদ্ধে ক্রোধে উন্মত্ত স্বপ্নসঞ্চারী জীবনের অবিনশ্বর আলোর স্পন্দন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি*

নদীর নাম (১৯৫৬) অথবা সমরেশ বসুর *গঙ্গার* (১৯৫৭) মতো মাহমুদুল হক নিপীড়িত জীবনের অন্তর্গূঢ় বৈচিত্র্যকে অপরিসীম মাহাত্ম্যের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। পরম্পরাগত পেশা, হাজার বছরের সংস্কৃতি আর চর্চিত জীবনাচার থেকে নির্মম বাস্তবতায় নির্বাসিত হয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ববাসনা, দ্রোহ ও দৃঢ়তা উচ্চকিত হয়েছে চলিষ্ণু কালস্রোতে।

নাগরিক পটভূমিতে রচিত গল্পগুলোতে মাহমুদুল হক আপসহীনভাবে জীবনের কানাগলি অন্বেষণ করেছেন। শহুরে মানুষের হীনতার নির্দয় অবয়ব তার গল্পের ছায়াহীন ভূখণ্ডে মানুষের অকপট দুঃখ হয়ে সহজ মহিমায় উন্মোচিত হয়েছে। "কোথাও এড়িয়ে যাওয়া নেই ঘুরিয়ে কথা বলা নেই, কোমল সহনীয় করে উপভোগ্য জীবনের মায়ারূপ সৃষ্টির কোনো ব্যর্থ চেষ্টা নেই" (চঞ্চল, ২০১৯ : ৭৮)। 'জোনাকি', 'অচল সিকি', 'সপুরা ও পরাগল', 'অচিনপুর' প্রভৃতি গল্পে মধ্যবিত্তের সংকট-গ্লানি-ক্ষয়িষ্ণুতা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি সুগভীর অনুরাগ উপনীত হয় মানবিক স্তরে। 'জোনাকি' গল্পে আবুল হোসেন সন্তান কর্তৃক নির্মমভাবে অপমানিত হয়েও মেলে ধরেন পিতৃস্নেহের কাতর করতল। আবুল হোসেন এখানে গড়পড়তা মধ্যবিত্তের ব্যর্থ জীবনের আদর্শবাদী ম্রিয়মান প্রতিনিধি। একাত্তরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সেজ ছেলের কষ্ট বুকের ভেতর পোড়ালেও ছোট ছেলে নাগা এবং কন্যার উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ তিনি। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তথা পুরো সংসারের উপর নিয়ন্ত্রণহীন এমন মানুষের আশ্রয় হয়ে ওঠে স্মৃতি ও প্রকৃতি। এজন্যই দুদিনের কথা বলে দশদিন গ্রামে কাটিয়ে আসতে হয় তাকে শান্তির আকাঙ্ক্ষায়। মানবিক সম্পর্ক হারিয়ে ফেলার এই ভয়াবহ সংকট নাটকীয়ভাবে উদ্ভাসিত হয় পুত্র কন্যার কক্সবাজার থেকে ফেরার পর কৈফিয়ত না দেয়া, পুত্রের পক্ষ নেয়া স্ত্রী ও পুত্রের হাতে আবুল হোসেনের প্রহৃত হওয়ার মাধ্যমে। সন্তানের হাতে প্রহৃত হয়ে আবুল হোসেন ছন্নছাড়া উৎকেন্দ্রিক মানুষে পরিণত হয় :

> ইচ্ছে হয়, ভালো করে মাথা ভিজাতে। ভরা বালতির ভেতরে মাথা গুঁজে দিতে। অবসন্নতা ক্রমশ কাবু করে ফেলে তাঁকে। অবসন্নতা, মনোবেদনা, স্থবিরতা এদের আর এখন কোনো সংকোচ কিংবা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। বয়সের কাছে নিদারুণভাবে তিরস্কৃত আবুল হোসেন, বয়স তাঁকে ধিক্কায় দেয়। গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠে গ্লানির গরল, অদ্ভুত এক গ্লানি। শৈশবে বিমাতার সংসারে নির্মমভাবে প্রহৃত হয়েছেন আবুল হোসেন, মনে পড়ে সেইসব। মনে পড়ে গ্রাম, এক একটি দীর্ঘদিন, গ্রামের জলবায়ু, মেঠোপথ, বিস্তীর্ণ শস্যখেত, মাটির গন্ধ, হুহু বাতাস, প্রহৃত হলেও সেখানে এসব ছিল। (মাহমুদুল, ২০২১ : ৪৫)

বিত্তের দাপটে বিক্রীত মানুষের আত্মা পচে গেলে সে নিপতিত হয় বাস্তবতার অতল গহ্বরে। প্রহৃত পিতাকে কন্যা এসে হাত ধরে স্নিগ্ধ স্বরে খাবার খেতে ডাকলে তাকে যেতে হয়। জীবন হয়ে ওঠে এমনই জোনাকির ডাকের মতো—বাতাসে গ্লানিজনিত আর্তির মাঝে ক্রোধে অপমানে ছিন্নভিন্ন হয়ে বেরিয়ে যেতে চায় সকল বন্ধন থেকে। ভেতর নিঃশেষ হয়ে যাওয়া আবুল হোসেনের অভিমানী মনে ঘুরে ফিরে আসে উন্মুল বেদনা। জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার ভার তাকে ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ করে দেয়। দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে বাস্তুত্যাগী গল্পকারের নিজের অভিমানী সত্তাই যেন উদ্ভাসিত হয় আবুল হোসেনের মধ্যে। মৃত্যুবোধের এক গভীর বিষণ্ণতা শেকড়ের কান্না হয়ে তাকে উৎকেন্দ্রিক গৃহচ্যুত করে তোলে। ভারতীয় চিরাচরিত মূল্যবোধের গোড়ার কুঠারাঘাত করে নাগা ধসিয়ে দেয় পিতাপুত্রের সম্পর্কের নিবিড় সূত্রটি, আর পরিস্থিতির কাছে পরাভূত পিতা উটপাখির মতো বালুতে মুখ গুঁজে নিজেই পান করেন বিনাশী সময়ের তীব্র হলাহল। আবুল হোসেনের এই নিদারুণ আত্মসমর্পণের প্রেক্ষাপটে জীবনের বেসুরো এক চিত্রকে অনায়াসে উন্মোচন করে দেখিয়েছেন গল্পকার।

মাহমুদুল হক তাঁর অধিকাংশ গল্পে মানুষকে বহুমাত্রিক সম্ভাবনাসহ উপস্থাপন করেছেন। 'অচল সিকি' গল্পে নবদম্পতি এনামুল-জেবুন্নেসা এক নির্জন বনভূমিতে বেড়াতে যায়। গল্পের শুরুতে শালবন বিহারের গেটে ঢুকেই দারোয়ানকে পাঁচ টাকা বকশিস দিয়ে আর এই বিরানভূমিতে

একাকি বসবাসের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে মেয়েটি তার মমতাময়ী হৃদয়ের পরিচয় পাঠকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। বয়ান ও বয়নে একটু একটু করে ভাজ খুলে বেরিয়ে আসে জেবুন্নেসার প্রেমাকুল হৃদয়, এনামুলের কবিত্ব, স্ত্রীর স্কুল শিক্ষকতার অর্থে নির্ভরতা—সবকিছু। তাদের কথাবার্তা ও খুনসুটিতে গল্প এগিয়ে যেতে থাকে। শালবন বিহারের জনমানবহীন রাস্তায় হাটতে হাটতে তারা জিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে আশ্রয় নেয় এক অশীতিপর বৃদ্ধের চায়ের দোকানে, নির্জন এই দোকানে চা-পানি পান, বৃদ্ধের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের কাহিনি শুনে সজল হওয়া—সবকিছুই মানবিক আবেদনে পূর্ণ। গল্প আরেকটু এগুলে জানতে পারি এনামুল-জেবুন্নেসা দম্পতি নিঃসন্তান। কিন্তু তখনও গল্পের আসল চমক বাকী রেখেছেন গল্পকার। গল্পের একদম শেষে এসে পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয় জেবুন্নেসার আসল চেহারা। নিস্তব্ধ নির্মল প্রকৃতি ভেদ করে প্রকটিত হয়ে ওঠে জেবুন্নেসার ভেতরকার অন্ধকার। পাঠক এক বিমূঢ় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, যখন সে বলে—"খুব তো ভয় দেখিয়েছিল যে ওই আনিঘষা সিকিটা চালাতে পারব না, বুড়ো কিন্তু টেরই পায়নি! [...] সেই অচল সিকিটার সৎকার করে এলাম" (মাহমুদুল, ২০২১ : ৫৫)। গল্পের শুরুতে দাড়োয়ানকে অকারণে পাঁচ টাকা দেয়া জেবুন্নেসা অসহায় বৃদ্ধকে তার ন্যায্য আট আনা ঠকিয়ে দেয়। 'শিয়াল রাজার বাড়ি' দেখতে গিয়ে এই দম্পতি নিজেরাই শৃগালপ্রতিম হয়ে ওঠে। মেকি মানবিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা জেবুন্নেসার কদর্য রূপ বেরিয়ে আসে। মায়াময় ও সহানুভূতিপূর্ণ মানুষগুলোর ভিন্নতর রূপ প্রত্যক্ষ করে পাঠক বিস্মিত হয়ে যায়। মাহমুদুল হক 'অচল সিকি' গল্পের মাধ্যমে যেন জানিয়ে দেন, মানুষ তাহলে এরকমই! বাইরে থেকে তাকে যেমন দেখা যায় সে আসলে হুবহু সেরকম নয়। তাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অবকাশ আছে; তাকে বোঝার জন্য আলাদা অবলোকন প্রয়োজন।

'বুলু ও চড়ুই' গল্পে আইয়ুবি সময় থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতায় বিপর্যস্ত একটি পরিবারের করুণগাথা বিধৃত হয়েছে। স্বল্পায়তন এই গল্পে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রচ্ছদপটে ইতিহাসের কিছু নির্মম সত্য স্থান পেয়েছে। স্বৈরশাসক আইয়ুবের সময়পর্বে সর্বাত্মক নিপীড়নের অংশ হিসেবে বুলুর পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বুলুর ভাই অনুর কারণে তাদের বাবাকে চাকরি খোয়াতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা বুলুকে তুলে নিয়ে যায়। এদের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে অপমানিত বুলু মৃত্যুর পথ বেছে নেয়নি বরং স্বপ্নময় স্বদেশের মানুষের মহানুভবতার মধ্যে মুক্তির স্বাদ অনুসন্ধান করেছে। নীলিমা ইব্রাহিমের *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (১৯৯৪), শাহীন আখতারের *তালাশ* (২০০৪) প্রভৃতি উপন্যাসে বীরাঙ্গনাদের দুর্দশার চিত্র প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে। এই গল্পে মাহমুদুল হক বীরাঙ্গনাদের বিড়ম্বিত চিরপরিচিত জীবনকে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। বুলুর ভাই অনু একাত্তরের যুদ্ধে চলে গেলে তার বাবা এই অপরাধে পাক আর্মিদের হাতে বন্দি ও নির্যাতনের শিকার হয়। কয়েকবার বাড়ি পাল্টিয়েও শেষ রক্ষা হয় না তাদের। ধর্ষিতা অবিবাহিতা বুলু মর্মান্তিক নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যে মুক্ত স্বদেশের স্বপ্ন দেখে খড়কুটোর বাসাচ্যুত চড়ুই ছানার প্রতীকে :

> 'বাসা থেকে বাচ্চাটি পড়ে গিয়েছিল, কী জানি কী করে। যতবার তুলে দেই ততবারই ওরা ঠুকরে ঠুকরে ওকে নিচে ফেলে দিচ্ছে, অবাক কাণ্ড না?'
> বুলু বললে, 'ওরা তো তোদের মতো মানুষ নয়!'
> 'তার মানে? তোর কথার কোনো মাথামুণ্ডু বুঝি না–'
> 'মানুষ বড় ভালো', বুলু বললে, তার চোখ তখন ভেজা ভেজা। বললে, 'মানুষ বড় সুন্দর!' (মাহমুদুল, ২০২১ : ৫৯)

পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা নিপীড়িত বুলু খুঁজে ফেরে স্নিগ্ধ কোমল মানবীয় স্পর্শ। তাই বাসাচ্যুত চড়ুই ছানার মতো বুলু নিজেকে পরিজনছিন্ন উপেক্ষিত মনে করে না। অনুর মতো ছেলেদের বুকে দেশপ্রেমের আবেগ আছে বলেই যুদ্ধোত্তর স্বদেশে নির্যাতিত বুলু বেঁচে থাকার ভরসা

পায়। পরিমিত সংলাপে ও গভীর নৈঃশব্দ্যের আবহে গল্পকার একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে মানুষের অনন্য অবদান ও আত্মবিসর্জনের কথা উপস্থাপন করেছেন। সমস্ত কলুষতা ও বেদনাময় স্মৃতির অন্ধকার থেকে মানুষ মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে মানবিক চৈতন্যের অনিঃশেষ আলোক-উৎসে।

জীবন সায়াহ্নে এক বৃদ্ধের জীবনের পাপ-পুণ্যের খতিয়ান 'বুড়ো ওবাদের জমা-খরচ' একটি অদিম বধ্যভূমির গল্প। সুবচনী নামের প্রাচীন একটি গ্রামে সংঘটিত নরমেধ যজ্ঞের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে এই আখ্যানে। বৃদ্ধ ওবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত এ গল্পে রূপক-আঙ্গিকের অনুসন্ধানও করা যেতে পারে। ব্রিটিশ আমল থেকে চুরি-ডাকাতিতে লিপ্ত সুবচনী গ্রামের মানুষদের জড়ো করে হত্যা করা হয়। গ্রামের এই মানুষদের হত্যাকাণ্ড যেন বাংলাদেশের রক্তাক্ত ইতিহাসই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুবচনী গ্রামটিই যেন হয়ে ওঠে একাত্তরের বাংলাদেশ, অসংখ্য বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়েছিল নিরীহ বাঙালিকে। নারী-পুরুষ-শিশুর আর্ত চিৎকারে কেঁপে উঠেছিল একাত্তরের আকাশ। সুবচনী গ্রামের লাঠি-সড়কি সজ্জিত বেপরোয়া যুবকেরা হয়ে ওঠে হিংস্র পাকবাহিনীর প্রতিচ্ছবি। খুনে দুর্বৃত্তরা সুবচনী গ্রামকে অভিশপ্ত জনপদ মনে করেছিল, যেমনটি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা মনে করেছিল বাংলাকে। এভাবে এক আদি জনপদের অনুষঙ্গে উদ্ভাসিত হয়েছে মৃত্যুতাড়িত একাত্তরের রক্তাক্ত ছবি।

ডাকাত পাড়ার ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পর ওবাদ তিনটি শিশুকে দাফনের ব্যবস্থা করে। আর এই নিষ্পাপ শিশুদের সমাহিত করার পূণ্য নিয়ে সে পাড়ি জমাতে চায় ওপারে। ওবাদের মতো একজন অন্যায়কারীও শেষ পর্যন্ত কিছুটা পূণ্য অর্জনের সুযোগ পায়। হতাশার মাঝেও কিছুটা আশার বাণীর সম্ভাবনা রেখে দেন লেখক—এখানেই মাহমুদুল হকের নিজস্বতা। যাপিত-জীবনের কালো অভিজ্ঞতা ও দারিদ্র্যলাঞ্ছিত অসহায়ত্বের অন্তর্স্রোতে ব্যক্তি হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে মানবিক অনুভব। পিতা-মাতার চৌর্যবৃত্তির অপরাধে তাই খুন হয়ে যাওয়া শিশুর গলিত লাশ কবরস্থ করতে গিয়ে এক অপার্থিব আচ্ছন্ন গলায় বুড়ো ওবাদ বলে :

> সোনারা, তোমাগো বাপ-মায়ে মাটি পায় নাই, তোমরা পাইলা। দুনিয়াতে তোমাগোর কুনো গুনা নাই, তোমাগোর মনে কুনো দাগ লাগে নাই, আল্লায় তোমাগোর কথা শুনব, আল্লার য্যান আমারে বেস্ত দেয়, সোনারা তোমরা কয়ো— (মাহমুদুল, ২০২১ : ৬৫)

গলিত মৃতদেহের নিকট এই প্রত্যাশার আপাত স্বার্থপরতা অত্যন্ত সরল হৃদয়ের এক বৃদ্ধের পাপময় জীবনের পরও স্বর্গপ্রাপ্তি যার আজন্মকালের স্বপ্ন। এসব সাধারণ আর্তির বাইরে এ কাহিনিতে যে মানবিকতার উৎসারণ—সেই অভীষ্টই মাহমুদুল হকের গল্পের কেন্দ্রস্থ আলোকবিন্দু।

শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত বেকার যুবকদের চিরপরিচিত অসহায়ত্বের বৃত্তান্ত 'একজন জামশেদ' গল্পটি। আরশাদ সাহেবের আশ্রিত ছোট ভাই বেকার জামশেদের দৃষ্টিকোণ থেকে তার চারপাশের দৃশ্যাবলি বিবৃত হয়েছে। এইসব দৃশ্যে মিশে আছে নৈতিক স্খলন ও যৌনবিকার, টিকে থাকার অসাধু উপায় সম্বলিত আধুনিক জীবনের কুৎসিত আবর্ত। চাকরির জন্য চেষ্টা ও ব্যর্থতা, বড়ো ভাইয়ের খোটা জামশেদকে উৎসাহী করে জীবনটাকে পরিবার ভাই-ভাবি, ভাবির মামাতো বোন তুহিনা ও প্রেমিকা ঝুনুর প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে। সেখানে প্রেম-অপ্রেমের সমন্বয়ে গোঁজামিল দিয়ে চলে মধ্যবিত্তের সংকটময় জীবন। বড় ভাই তার মেদবহুল স্ত্রীকে লুকিয়ে কাজের মেয়ে রোকেয়ার মাকে চেপে ধরে রান্না ঘরে। একটি চাকরি হয় না বলে কীটের মতো নিঃশব্দে জীবন ধারণ করে জামশেদ। বেকারত্বের জন্য নিজে দায়ী না হলেও সমাজের চোখে সে অগস্তকের মতো। জামশেদের মনোজগতে তোলপাড় হলেও সমাজের কাছে তা মূল্যহীন। ভাবীর মামাতো বোন তুহিনার দেহকে এড়িয়ে চলার অবদমিত প্রতিক্রিয়ায় ভুগে জামশেদ নিজেকে ধিক্কার দেয়। উপরিভদ্রতার ধার না ধেরে শেষ পর্যন্ত সে বান্ধবি টুনুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য রোকেয়ার মায়ের কোমর হতে টাকা বের করে নেয়। বড় ভাইয়ের

সঙ্গে দেহারতির বিনিময়ে টাকা পেয়েছিল রোকেয়ার মা। ফলে সমূহিক স্খলনের পরিবেশে জামশেদ নিজেও ডুব দেয় গহীন অন্ধকারে। উৎফুল্ল মনে টুনুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে তার মনোজগতে আনন্দের ধারা বয়ে যায় :

> সে এখন ফুল বাগানের সিঁথি বরাবর হাঁটছে, ফ্লক্সহলিহক ভালো আছে, সবকিছু ভালো আছে, চড়ুইদের মন ভালো আছে, গার্ডেনিয়া ভেনাস্টা কী চমৎকার জাল বুনে রেখেছে জাফরিকাটা মাচানে, চিকন সুতোয় বোনা শীতের গায়ে ঝিলমিল করছে সিল্ক রোদ। সবকিছু স্পটলেস, ফ্ললেস, চমৎকার, চমৎকার এবং চমৎকার, হ্যালো গোলাপজাম হ্যালো পাউডারপাফ, হ্যালো– (মাহমুদুল, ২০২১ : ৭১)

জামশেদের নিষ্ফল আক্রোশ এভাবে চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে জটিল মনস্তত্ত্বের বিকল্প আবহের আশ্রয় নেয়। প্রেম ও প্রেমিকা দর্শনের মূলে রচিত হয় বিশ টাকার চমৎকার কূটাভাস। জামশেদের নাগরিক প্রেমের আনন্দধারায় ভেসে যায় রোকেয়ার মায়ের সঙ্গে তার কদর্য আচরণের স্মৃতি।

'সপুরা ও পরাগল' গল্পটি সমাজের বীভৎসতার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার উপর গড়ে উঠেছে। জীবনের এক ধরনের অমরতার ভান আছে—ওষ্ঠাগত প্রাণেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। অস্তিত্ব বাসনার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রিয়ভারাতুর আবেগের তীক্ষ্মতায় সঞ্জীবিত এই গল্পের প্রতিটি চরিত্র। ক্ষতবিক্ষত ব্যধিগ্রস্ত, অসুস্থ, ঘৃণ্য জীবনে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা—তবু অস্তিত্বায়নের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা সপুরা, ময়মুনা, পরাগলের মানবিক অনুভূতিশূন্য হৃদয়লোকে জাগ্রত। মালগনি মিয়ার ভিক্ষুক বানানোর কারখানায় অঙ্গহানি করে ভিক্ষুকদের পঙ্গু করা হয়। এইসব পঙ্গু বিকারগ্রস্ত মানুষেরাই তার ব্যবসায়ের অবলম্বন। পরাগলের কুড়ালের কোপে সপুরার পাও ছিন্ন হয়েছিল এই কারখানায়। অঢেল স্বাস্থ্যের সঙ্গে এই ছিল পাখানাই তার জীবিকার অবলম্বন। গল্পকার সপুরাদের জীবনের আরও গভীরে প্রবেশ করে জীবন ক্ষুধার অপর এক চিত্র তুলে আনতে চেয়েছেন। প্রতি রাতে ভিক্ষা শেষে পরাগল কাঁধে ঝুলিয়ে সপুরাকে তার ডেরায় পৌঁছে দিলেও মনে মনে তার লালসা সপুরার দেহের প্রতি। যে পরাগল মালিক মালগনির আদেশে সপুরার দু'পা কেটেছে, সে-ই সুযোগ বুঝে সপুরার বুকে পিঠে হাত বুলায়; রক্তমাংসের আহ্বান জানায়। হৃদয়হীন শহরের অলিগলিতে জন্ম নেয়া দানবীয় নিষ্ঠুরতার এই গল্পভাষ্যে বিবমিষার উদ্রেক করে। জীবনের ভয়াবহ বীভৎসতা হয়ে ওঠে অন্ধকারের সমার্থক :

> এইবার অন্ধকার গুমরে উঠছে। চিমনির ধোঁয়ার মতো হলহল করে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। রংচটা দেয়ালের গায়ে পিঠ রেখে আকাশের দিকে তাকাল সপুরা, এখন আর তার কোনো বোধশক্তি নেই, ক্ষুধা নেই, দুঃখ নেই, নৈরাশ্য নেই, শুধু বসে থাকা, কিছু না ভাবা, কিছু না দেখা, শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা—
>
> এইভাবে মরাকাঠের গুঁড়ির মতো সে বসে থাকে। যে চাপা ক্রোধ মাঝে মাঝে ভেতরে ভেতরে তাকে ছোবল মারে এখন আর তার কোনো অস্তিত্ব নেই, এমন অবস্থায় তার কোনো ব্যথা থাকে না, খেদ থাকে না, সে বেওয়ারিশ হয়ে যায়, তসরুফ করে ফেলে কেউ তাকে। (মাহমুদুল, ২০২১ : ৭৪)

সপুরার পচনশীল কর্তিত পা হয়ে ওঠে মানবীয় পচনের সমার্থক। সপুরার ওপর যেমন পরাগলের কুদৃষ্টি তেমনি হতশ্রী নোংরা ভয়ঙ্কর পেত্মীর মতো মায়মুনাকে ভোগ করে মজা পায় মালগনি। এভাবে নিপীড়নে নিষ্পেষণে মালগনি আর পরাগল শ্রীহীন অসহায় মায়মুনা সপুরাদের বিধিলিপি নির্ধারণ করে দেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *প্রাগৈতিহাসিক* গল্পের মতো এ গল্পেও অপাঙ্‌ক্তের জীবনের শেকড় সন্ধানে লেখক অবগাহন করেন মানবপ্রবৃত্তির আদিতম অন্ধকার প্রদেশে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পটভূমিতে এক প্রথাবিরোধী জীবনবোধের গল্প 'ছেঁড়া তার'। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ দেখা হওয়া দুই বন্ধুর জীবনে ঘটে যাওয়া নানা অভিজ্ঞতার স্মৃতি রোমন্থন এই গল্পের উপজীব্য। মকবুলের শৈশবের রুগ্নস্বাস্থ্য ও খিটখিটে মেজাজ এবং নজরুলের শারীরিক সুস্থতা ও সাহসিকতার বিষয়ে দুই বন্ধুর পারস্পরিক আলাপচারিতায় জানা যায়। দেশমাতৃকার প্রতি নজরুলের নিবেদন এবং একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের স্মৃতিচারণও বাদ যায় না :

> ঠিক অমনি করে আরো একদিন কেঁদে ফেলেছিলাম, একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ, রেডিওতে আমার সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি শুনে, মনে হয়েছিলো তোমার সেই দেশমাতৃকার মুখ এমন করুণ এমন দুঃখিনীর যে বুক হাহাকার করে। সেদিনও তোমার কথা মনে হয়েছিল— (মাহমুদুল, ২০২১ : ৮১)

আশৈশব প্রতিবাদী নজরুল পালাতে জানে না কোনো অবস্থাতেই। বিশে ফেব্রুয়ারি রাতে লালবাগের গুন্ডাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে তার পা খোড়া হয়ে গিয়েছিল, তবু অন্যদের মতো সে পালিয়ে যায়নি। অন্যায়ের সাথে আপস না করে সাহসী নজরুল ঔদ্ধত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির উত্থান নজরুলকে বিবর্ণ করে দেয়। আনন্দ আর গর্বে ভরা স্বাধীনতার স্মৃতিগুলো তখন অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময়ে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ও মুক্তিকামী মানুষের আপসমূলক সহাবস্থান সংবেদনশীল লেখককে ব্যথিত করেছিল। শিক্ষাজীবন ও রাজনীতি একই বিন্দু থেকে শুরু করলেও মকবুল ও নজরুলের চলার পথ আজ ভিন্ন। আপসহীন নজরুল জীবনে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি কিছুই পায়নি, বরং প্রতিবাদী স্বভাবের জন্য অনেক কিছু হারিয়েছে। অন্যদিকে নজরুল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও জীবনের আদর্শে অনেকটাই আপসকামী। অন্তঃসারশূন্য সাজগোজের শহরে প্রকৃত শিক্ষার প্রতি অবহেলা অনুভব করে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নজরুল। একারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপনে মন্ত্রণালয় বানান ভুল দেখে রাস্তার পাশের ইট সজোরে ছুঁড়ে বিজ্ঞাপনটি ভেঙে দিতে এতটুকু ইতস্তত করেন না সে। নজরুলের এই শক্ত শিরদাঁড়া ও সাহসী মনোভাব বাঙালির পৌরুষময় অহংকারের পরিচায়ক।

'হলধর নিকারীর একদিন' গল্পটি গ্রামীণ শক্তিবর্গের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়ার ছন্দময় আখ্যান। কাহিনি অন্তর্স্রোতে গল্পকার নিকারী শ্রেণির দৈনন্দিন জীবনের নানা সংগ্রাম, ব্যক্তি জীবনের চিরন্তন প্রেমাকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রে সহিংস রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। আবহমান গ্রাম জীবনের সামন্ত কাঠামোর পরতে পরতে জন্ম নেয়া ছোট-বড় শক্তিবর্গের সংঘাত ও টানাপড়েনের অমীমাংসিত রহস্য চিত্রিত হয়েছে এই গল্পের ক্যানভাসে। চৈতন্যদাস ও তার পুত্র হলধর নিকারীর জীবন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে পূর্ণ। জেলেদের জন্য আনা সুতোর বান্ডিল দাদন মুনশি গ্রাস করে এবং গোপনে নদীপথে সেগুলো বহন করতে হয় চৈতন্যদাসকে। প্রয়োজনীয় অর্থ ও জাল দিয়ে জেলেদের বিপদে তাদের সাহায্য করে মুনশি তাদের সব সুতা লুণ্ঠন করতে চায়। দাদনের প্রশ্নে বিপ্রতীপ শক্তির উত্থানেরও আভাস পাওয়া যায় :

> হুঁশ কইরা দেহিছ হলধর, জাউল্যাগ লয়া অহনে পলিটিক্স শুরু হইছে, লাই দিয়া যেমুন কাঁধে উঠাইতাছে ফয়-ফকিরগুলিরে, এগুলিরে দরদ কয় না, গদি মজমুত করনের লাইগা কতো খেইল দেহাইব মিয়াছাবেরা, ভক্করচক্কর বুঝি না মনে করছ? অহনে আমাগো কি হইবো, নিকারীগুলি আসমান থিকা পড়ছিল? হ্যাগো প্যাট নাই? ফালাইন্যা ভাবতাছেনি আমাগোরে? ক্যান, নাও নিয়া জাল দিয়া ট্যাকাউকা দিয়া বাঁচায়া রাহি নাই হুয়োরের পুতেগো, তহন আছিল কই মিয়াছাবেরা, অহনে খাউজাইয়া উঠতাছে, আমাগোরে ভাতে মারণের রাস্তা দেহাইতাছে বেজন্মাগুলিনরে। (মাহমুদুল, ২০২১ : ৮৫)

নবোত্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাবে হলধর নিকারীর ব্যক্তিজীবনেও ভাঙন দেখা দেয়। তার বিগত যৌবনা স্ত্রী মেনকার সঙ্গে খুড়তুতো ভাই কেশবের বিবাহ পূর্ববর্তী ঘনিষ্ঠতা হলধরে মনোজগতে সন্দেহের বীজ বুনে দেয়। সেই কেশব এখন ঘাটের সর্দারি বাগিয়ে নিতে উদগ্রীব। তাছাড়া একাত্তরে সিরাজদিখাঁর আর্মি-ক্যাম্পে তিনদিন থেকে মেনকার পালিয়ে আসার স্মৃতি হলধরের জীবনে ক্ষতচিহ্নের মতো হয়ে আছে। চারপাশের এই বৈরি পরিস্থিতিতে টালমাটাল হলধর ভিন্ন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শ্রেণিশত্রু খতমের নামে গলাকাটা রাজনীতির আবির্ভাব ঘটে। ভগির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নকশাল দলের কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় হলধরের। মুখে শ্রেণিশত্রু খতমের শ্লোগান দিলেও তারা নিজেরাই জড়িত হয় খুন-ডাকাতি-রাহাজানিসহ ভয়ানক অন্তর্কলহে। নীতিহীন আদর্শচ্যুত এসব লোকদের অর্থের লোভ দেখিয়ে হলধর নিজের পক্ষে টেনে আনে। দাদন মুনশি আর কেশবের সামনে জন্ম নেয় নতুন উঠতি ধনিক হলধর। একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে নব্য ধনিক শ্রেণি সৃষ্টির একটি অলিখিত ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে হলধরের উত্থানের মধ্য দিয়ে। সামাজিক-রাজনৈতিক নৈরাজ্যের সুযোগ নিয়ে নব্য পুঁজির মালিকেরা রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক নেতৃত্বের স্থানও দখল করতে উদ্যত হয়।

মাহমুদুল হক তাঁর 'অচিনপুর' গল্পে মানুষ ও মানবসম্পর্কের এক নিখুঁত আখ্যান নির্মাণ করেছেন। অচিনপুরের অচেনা মানুষের এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র। প্রতিক্ষণে চেনা মানুষের মাঝে জন্ম নেয় অচেনা মানুষ। মানব-চরিত্রের বিবর্তমান একান্ত অনুভূতিগুলোকে পাঠকের সামনে অকৃত্রিমভাবে তুলে ধরেছেন সংবেদনশীল গল্পকার। 'অচিনপুর' গল্পে প্রধান চরিত্র মিনুর অসুস্থতায় সুখের সংসার অচমকা নতুন রূপ লাভ করে। ভালোবাসার স্বামীটি হয়ে যায় এক অচেনা পুরুষ। কিছু দিন যেতে না যেতে নতুন নারী আর নতুন সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নতুন স্ত্রীর বাহানা পূরণে ব্যতিব্যস্ত স্বামী অসুস্থ স্ত্রীর খোঁজ নেয়ার সময় পায় না। ঘরের চার দেয়ালে বন্দি পক্ষাঘাতগ্রস্ত মিনুর পৃথিবী। সক্ষম থাকা অবস্থায়ও কখনও প্রকৃতি, সবুজ, কদমফুল, বকুল, গন্ধরাজ দেখা হয়নি তার সাংসারিক ব্যস্ততায়। একমাত্র সন্তানটি ডাকাতি মামলার আসামি হয়ে জেলে। ইট-কাঠের পরিবেশে যান্ত্রিক মানুষগুলোর কাছে মিনুর কোনো কিছু চাওয়া অবশিষ্ট নেই। বদ্ধ ঘরে অবারিত প্রকৃতি তাকে ধরা দেয় স্মৃতি বাহিত হয়ে :

> অথচ সোনালি মাছ সবুজ গঙ্গাফড়িং কদমফুল ন্যাকড়ার পুতুল সারা জীবনভর স্বপ্নের ভিতর একা একা খেলা করে ফেরে। সেই জীবনটার জন্যে আমার মাঝে মাঝে কান্না পায় টুপু, পাখির একটি রঙিন পালক আঁটা কাগজের তুচ্ছ মুকুটে তখন রাজরাজেশ্বরী মনে হয় নিজেকে। রং-বেরঙের ভাঙা কাচের চুড়ির শিকলের জন্যেও আমার কষ্ট হয়। ঘুঘুডাকা দুপুর, নিস্তব্ধ ফাঁকা মাঠ, গরুর পাল, হুহু বাতাস, বাঁধানো শান ঘাট, ঝুরিওলা অশত্থ, এক একটা দিন—
>
> এইসব কান্নার মতো, দীর্ঘশ্বাসের মতো। এ যেন এক অচিনপুরের দুর্গে নিদারুণ বন্দিদশায় দিনের পর দিন গলা চিরে ক্রমাগত চিৎকারের পর চিৎকার করে যাচ্ছি, পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার তা ফিরে ফিরে আসছে। (মাহমুদুল, ২০২১ : ১০২)

'অচিনপুর' গল্প জুড়ে রয়েছে বর্তমান থেকে অতীতের স্মৃতিতে পালানোর চেষ্টা। শিক্ষিত বেকার ভাগ্নে গ্রাম থেকে প্রতিনিয়ত চিঠি পাঠায় টাকা পাঠানোর জন্য। মামীর বেদনার কিছুটা অংশীদার হয় এই অসহায় টুপু। দুদিক থেকে দুজন অসহায় মানুষ নিজেদের বর্তমান দিয়ে আক্ষেপের পরিবর্তে অতিবাহিত অতীতের স্মৃতির মাঝে স্বস্তির সন্ধান করে। গল্পের সমাপ্তিতে মিনু অবশ্য নিজের অক্ষমতা উপেক্ষা করে মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্য পেতে সক্ষম হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অস্থির বাস্তবতার পরিচয়ে ঋদ্ধ এক অনবদ্য গল্প 'প্রতিদিন একটি রুমাল'। প্রতিটি মানুষের মাঝে বাস করা অপরিজ্ঞাত মানুষটি প্রতিদিন নিজেদের নতুনভাবে আবিষ্কার করে। আলোচ্যমান গল্পে আলতাফ ও সবুজ কলেজ জীবনের দুই বন্ধুর দেখা হয়

দীর্ঘদিন পর। দুই বন্ধুর আড্ডার আলাপনে পাঠক জেনে যায় তাদের অতীত জীবনের অনেক অজানা কথা। কলেজ জীবনে দারুণ স্মার্ট, তুখোড় বক্তা ও নামী খেলোয়াড় সবুজ এখন ইছাপুরা নামক গ্রামের এক অখ্যাত কলেজে অল্প বেতনের শিক্ষক। স্ত্রী-সন্তানকে ঢাকায় রেখে নিজে একা চাকরিস্থলে বসবাস করে। বেতনের সামান্য টাকায় স্ত্রী রেখার 'অসাধারণ সাংসারিক নৈপুণ্যে' তার সংসার চলে। সম্ভাবনাহীন একঘেয়ে অনুজ্জ্বল জীবনে সবুজ বড় কোনো চিন্তা করতে ভয় পায়। জীবনে তার জমে উঠেছে শত অসন্তোষ, আর ব্যর্থতার গ্লানিবোধ। অন্যদিকে তার বন্ধু আলতাফের কাছে জীবন মানেই মজা-আনন্দ-স্ফূর্তি। সময়ের বিবর্তনে দুই বন্ধু দুই মেরুর মানুষরূপে গড়ে উঠেছে। অতিবাহিত জীবন আর কাঙ্ক্ষিত জীবনের মাঝে সবুজের দূরত্ব থাকলেও আলতাফ আদায় করে নেবার কানুন আয়ত্ত করেছে। আলতাফের কাছে সময়টি অনুকূল। প্রতিদিনই সে বিশুদ্ধ বণিকের মতো নারীদেহ বা প্রেম খরিদ করে। তার কাছে নারী মানেই স্থূল মাংসপিণ্ড; যৌন উপভোগ ছাড়া নারীর অন্য কোনো মূল্য নেই। আলতাফের ভাষ্যে :

> আমি শালার বিশুদ্ধ বণিক, টাকা-পয়সা দিয়ে প্রেম কিনি, দৌলত দিয়ে মব্বোতের সওদাগরি করি, ময়ূরপঙ্খী ভাসাই, আমার কাছে কি না প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাতে আসে! কতটুকু জানিস তোরা মেয়েদের? ক'টা মেয়ে দেখেছিস তোরা? কজনের সঙ্গে মিশেছিস? অভিজ্ঞতা বলতে তো একমাত্র ঐ বিয়ে করা বউ, যা কি না আগাপাস্তলা একটা জোড়াতালি আর গোঁজামিলের ব্যাপার, শুধু সেইটুকুই! (মাহমুদুল, ২০২১ : ১০৯)

আলতাফের মতো তেজোদীপ্ত যুবকের আচার-আচরণের যে ভাবটি প্রকাশ পায়, তাতে লেখক সূক্ষ্মভাবে তৎকালীন সময়ের যুবকদের মানসিক বিপর্যয়ের বিষয়টি ব্যক্ত করেন। প্রাইভেট কারে সবুজকে নিয়ে পথে পথে মেয়ে মানুষ খুঁজে বেড়ায় আলতাফ। সবুজের মতো অন্য বন্ধুদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ কথার মধ্যে বেরিয়ে আসে তার পুরুষালি যৌনস্পৃহা। কদর্যভাবে মেয়েদের পেছনে ছোটা ক্ষুব্ধ আলতাফ একটি মেয়েকে গাড়িতে তুলতে ব্যর্থ হয়ে রিক্সাসহ চাপা দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। ক্ষমতার দাপট আর আত্ম- অধিকারের উন্মত্ততায় চারপাশের সবকিছু ভেঙে পড়ে। আলতাফের লাগামহীন লাম্পট্যে বিধ্বস্ত এই সময়ের সবকিছুই যেন চলে গেছে নষ্টদের অধিকারে। 'প্রতিদিন একটি রুমাল' হারিয়ে শেষ পর্যন্ত আলতাফ যেন নিজের গন্তব্যও হারিয়ে ফেলে। স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে গিয়ে পঙ্কিল অন্ধকারে নিমজ্জমান বিভ্রান্ত আলতাফ হয়ে ওঠে গন্তব্যহীন লক্ষ্যবর্জিত যুবশক্তির মূর্তিমান প্রতিনিধি।

পরিবর্তমান সময় ও সমাজ, আর্থ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, চারিদিকে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জ ব্যক্তির জীবনপ্রণালি ও শিল্পজগতকে প্রভাবিত করে। সংবেদনশীল শিল্পীহৃদয়ে সময়ের অভিঘাতের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। মাহমুদুল হকের গল্পের বিষয় নির্বাচন, কাহিনি গ্রন্থনা, ভাষা বিন্যাস—প্রতিটি পর্বে সময় ও সমাজ সংলগ্নতার অন্তরালে নিহিত ছিল মানবিক নির্বেদ ও জীবনের প্রতি অন্তর্লীন প্রেমানুভব। *প্রতিদিন একটি রুমাল* গ্রন্থের প্রতিটি আখ্যান, ঘটনাপরম্পরা ও চরিত্রায়ণ সময় ও স্থানলগ্ন। এসব গল্পে পারিবারিক সুখ-দুঃখ, সমাজের ক্লেদ, নিম্ন ও মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব-সঙ্কট, একই সঙ্গে জীবনের প্রতি অতলান্তিক মমতা প্রকাশ লাভ করেছে। জীবনের সকল ক্লান্তি ক্ষোভ-নৈরাশ্য-শূন্যতার বিপরীতে মানুষের অপরাজেয় মানবিক চৈতন্যের জাগরণ তাঁর শিল্পভাবনার অনিষ্ট। "তবে তা বিপ্লবী ঘোষণার মতো উচ্চকণ্ঠ নয়, জীবনের মতো করুণ, নিসর্গের মতো সবুজ আর আলো-আঁধারের মতো নিবিড়, স্বাভাবিক ও স্বপ্নসঞ্চারী" (মোস্তফা এনাম, ২০২১ : ১১৯)। প্রতিটি গল্পে দুঃখ, বঞ্চনা ও কঠিন নিপীড়নের অন্তর্স্রোতে জীবনের অপার সম্ভাবনা সুচিহ্নিত। ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসার বিবিধ পরিপ্রেক্ষিত ও মানব-সম্পর্কের বিচিত্র পরিসর রূপান্তরে লেখক পরিভ্রমণ করেছেন ব্যক্তির অন্তর্লোক, পারিবারিক ঘটনাস্রোত ও ইন্দ্রিয়বাসনার বিচিত্র পথে। মানুষের বহুমাত্রিক সুখ-দুঃখের

কথকতা, নিষ্পেষিত জীবনের রসায়ন, মনোলোকের ধূসরতা কখনো কথনভঙ্গির অন্তর্বয়নে, চেতনাপ্রবাহ রীতির অনুশাসনে, কখনো লেখকের স্বয়ংক্রিয় চিত্ররূপময়তায় শিল্পীত হয়েছে। মাহমুদুল হকের ছোটগল্প তাঁর ক্রমোত্তীর্ণ শিল্পচেতনার অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা ও আধুনিকতা সঞ্চারী স্বাতন্ত্র্যে ঋদ্ধ। তাঁর গল্পে অন্বিত ভাষা নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেনি, বরং কাহিনির মধ্যে সঞ্চারিত করেছে লক্ষ্যভেদী ও নান্দনিক অভিপ্রায়। আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতাকে তিনি নবরূপে উপস্থাপন করেছেন বাংলা কথাসাহিত্যে। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অভিলাষে প্রতিটি লেখাতেই তিনি নতুনভাবে হাজির হয়েছেন পাঠক সমীপে। তাঁর গদ্য নির্ভার, নির্মেদ ও কাব্যগন্ধী। সহজ ভাষার সাবলীল উচ্চারণে মাহমুদুল হক সমাজের নিত্যতাকেই উপস্থাপন করেছেন তাঁর সাহিত্যে।

মাহমুদুল হক বাংলা কথাসাহিত্যে বিরলপ্রজ ও ব্যতিক্রমী শিল্প-প্রতিভা। মানব জীবনের জটিলতাকে তিনি বহুতল স্পর্শী শৈল্পিক দক্ষতায় বাঙ্ময় করে তুলেছেন। ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ রূপকল্প বর্ণনায় অন্তর্লীন জিজ্ঞাসার দিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন। তাঁর সৃষ্টির বিভাময় জীবন ও সত্তার টুকরো ছায়া-প্রতিচ্ছায়া তাঁর মানবসম্বন্ধ সিঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে আহরিত। বিষয় ও প্রকরণগত দক্ষতা, আধুনিক শিল্প ও দর্শনের সবিশেষ ধারণা, মানব-অস্তিত্বের স্বরূপ ও মানবিক আশ্রয় সন্ধানের বোধ তাঁর কথাসাহিত্যে সুগভীর প্রজ্ঞাময়তায় সংহত। একের পর এক গল্প লিখে তিনি নির্মাণ করেছেন নিজস্ব শিল্পভুবন ও চিত্রকল্পময় সাহিত্যভাষা। সাহিত্যে আধুনিকতার রূপায়ণ ও কাহিনির সঙ্গে অনুপম গদ্যের সমন্বয় মাহমুদুল হকের কথাসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রান্ত। যাবতীয় ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনার মধ্যে জীবনকে অঙ্গীকার করেও বিচ্ছিন্নতা ও নৈরাশ্যের অন্তর্বয়নে তাঁর চরিত্ররা আধুনিক। অসম্ভব গতিশীল ও জাদুময় সংলাপ সৃজন, চরিত্রের মনোজাগতিকতা পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে নানা উপাচার সংযোজন ও নন্দন-ভাবনার বিভিন্ন প্রকৌশল প্রয়োগ তাঁর সৃষ্টিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। মাহমুদুল হকের ছোটগল্পসমূহ সেই অনিবার্য সংযম ও পরিমিতিবোধের যথার্থ নান্দনিক প্রজ্ঞার পরিচয়ে মহিমান্বিত।

সহায়কপঞ্জি

আবু হেনা মোস্তফা এনাম (২০২১)। *মাহমুদুল হক : সৃষ্টি ও শিল্প*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

চঞ্চল কুমার বোস (২০১৯)। *মাহমুদুল হকের কথাসাহিত্য : বিষকুম্ভে জীবন*। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মাহমুদুল হক (২০২১)। *মাহমুদুল হক রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সিরাজ সালেকীন (২০১৪)। 'আক্ষেপ ও আদরের গল্প'। *গল্পকথা*, (সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার) বর্ষ-৪, সংখ্যা-৫, রাজশাহী।